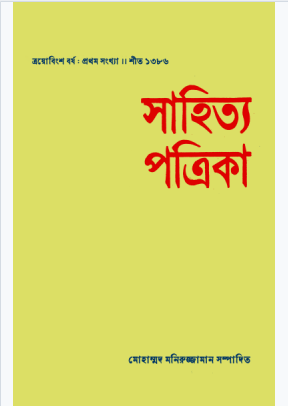

Vol. 23 | No. 1 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর

Volume	23
Issue	1
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাহবুবা সিদ্দিকী
Published online	December 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v23i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i1.5
Pages	75-87
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর

মাহবুবা সিদ্দিকী

সিকান্দার আবু জাফর মূলতঃ কবি; অতঃপর নাট্যকার। ১৯৪৭ সালের আগে নাট্যকার হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি তৎকালীন ঢাকার রেডিওর সঙ্গে যুক্ত হন। আরো পরে, ১৯৫১ সালে, 'শাবিস্তান' নামে তিনি একটি নাট্যসংস্থা গঠন করেন এবং তারই প্রথম প্রয়াস হিসেবে শচীন সেনগুপ্তের 'নবাব সিরাজ-দ্দৌলা' নাটকটি মঞ্চস্থ করবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন কারণে প্রচুর অর্থব্যয় করে এবং দীর্ঘ ছয়মাসের প্রচেষ্টাতেও 'সিরাজদ্দৌলা'র অভিনয় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজ-দ্দৌলা' অভিনীত না হলেও কবি হতাশ না হয়ে নতুন উদ্যমে নিজেই নাটক রচনায় হাত দেন এবং মাত্র সাত দিনে রচিত হয় তাঁর প্রথম নাটক 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা'। এই হচ্ছে নাট্যকার হিসেবে কবি সিকান্দার আবু জাফরের আত্মপ্রকাশের পটভূমি। এরপরে তিনি বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে 'মহাকবি আলাউল' এবং 'শকুন্ত উপাখ্যান'-ই প্রধান।

সিরাজ-উ-দ্দৌলা

১৯৬৫ সালে সিকান্দার আবু জাফরের প্রথম নাটক 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য এটি ঐতিহাসিক নাটক এবং এজন্যই নাটকটির গুরুত্ব বেশী। কারণ ঐতিহাসিক নাটকে নাট্যকারের স্বাধীনতা কম অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা বেশী। নাট্যকারকে সবসময়ই সচেতনতার সংগে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন কাহিনী, চরিত্র এবং তথ্যসমূহ যতখানি সম্ভব নির্ভুল হয়; বিশেষতঃ প্রধান ঘটনা এবং প্রধান চরিত্রাদি প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে কাহিনীর প্রয়োজনে কিছু কিছু পার্শ্বচরিত্র এবং শাখা-কাহিনী লেখক যুক্ত করতে পারেন কিন্তু তাঁকে সবসময়ই লক্ষ্য রাখতে হয় যে এই শাখাকাহিনী বা কাল্পনিক চরিত্রগুলো যেন কোনভাবেই মূল কাহিনীর ধারা বা তথ্যকে বিঘ্নিত না করে। 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটক রচনার সময়ে এই আশঙ্কাই সর্বাধিক ছিল। কারণ সিরাজ-চরিত্র সম্পর্কে সত্যমিথ্যা মিশ্রিত এত বেশী কাহিনী প্রচলিত ছিল বা আছে যার মধ্য থেকে প্রকৃত সিরাজ-চরিত্রকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। নিজেদের স্বার্থেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সিরাজদ্দৌলার নামের সংগে যতদূর সম্ভব পাপ, অনাচার, অত্যাচার এবং চরিত্রহীনতার অভিযোগ লেপন করে প্রচার করেছে। উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের শাসনকে এদেশে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করা। শোষণের রূপটিকে আড়াল করে রাখা। যদি সিরাজদ্দৌলাকে অত্যাচারী এবং দুশ্চরিত্র শাসক বলে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়, তবেই তা সম্ভব, কারণ তাহলে এটা সহজেই প্রতিপন্ন হবে যে সিরাজের অযোগ্যতার ফলেই দেশের দুরবস্থা হয় এবং এই অযোগ্য, অত্যাচারী এবং লম্পট

"শত দোষ যদিও আমার,
তবুও উচিত হে তোমা সবাকার,
সে সকল করিতে মার্জনা।
স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন,
হিতাহিত ছিল না বিচার,
মদ্যপানে করিয়াছি শত শত দুর্নীতি ব্যভার!
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন,
বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ শয্যায়,
শেষ বাক্যে তাঁর
জন্মিয়াছে ধারণা আমার
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার;
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে,
প্রজার মঙ্গলকার্য্য সতত সাধন,
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।
যথা সাধ্য আত্ম সংশোধন
চেষ্টা করি দিবানিশি।
সিংহাসনে হয় যদি সকত স্থাপিত,
বাঙ্গালার নাহি ক্ষতি তাহে।
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গালায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব।
কিন্তু সাবধান—
নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে সূচ অগ্র স্থান।"[৯]

১৯৩৮ সালে শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনীত হলে পরে নাটকটি প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর মূল কারণ সিরাজদ্দৌলাকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে চিত্রিত করে ইংরেজদের স্বরূপ তুলে ধরায় নাট্যকারের দক্ষতা। শচীন সেনগুপ্তের সিরাজ-চরিত্রে যদিও কিছু বিচ্যুতি আছে তথাপি নাট্যকার একথাও প্রচার করতে দ্বিধা করেননি যে, সিরাজ-চরিত্রে যে-সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও কলঙ্কের বোঝা আরোপিত হয়েছে তার প্রচারক বিশেষ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এবং তারা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই সিরাজ সম্পর্কে বিভিন্ন গল্পকথা রচনা করেছে। প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার তাঁর নাটকে সিরাজদ্দৌলাকে যে রূপে চিত্রিত করেছেন তাতে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সিরাজদ্দৌলা ভোগী নয়, বরং বীর এবং দেশপ্রেমিক। তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বাংলার জন্য তীব্র ভালোবাসা, আবেগে যার প্রকাশ:

> বাংলার মান, বাংলার মর্যাদা, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে আপনারা আপনাদের শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে সবরকমে আমাকে সাহায্য করুন। আপনাদের সমবেত চেষ্টার ফলে যদি এই বিপদ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাই, তাহলে একদিন আপনারা আমার বিচারে বসবেন। সেদিন যে দণ্ড আপনারা দেবেন আমি মাথা পেতে নিব। ---বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা! ---বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল

৯ "গিরিশ রচনাবলী" ১ম খণ্ড, ১৯৬৯, কলিকাতা, পৃ. ৫৬৩

> প্রান্তরে আজ রক্তের আলপনা, জাতির সৌভাগ্য-সূর্য আজ অস্তাচলগামী, রুগ্ন সন্তানের শিয়রে রোরুদ্যমানা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত'।[১০]

সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকটি কিছু কিছু দিক থেকে উপরোক্ত প্রধান দু'জন নাট্যকারের নাটক থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। এ নাটকটিতে নাট্যকারের কিছুটা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পরিস্ফুট। নাটকের 'প্রসঙ্গ কথায়' সিকান্দার আবু জাফর বলেছেন :

> ইংরেজদের সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক প্রচারণা অবিসংবাদী সত্য হিসেবে গৃহীত সিরাজ-উ-দ্দৌলার বর্বরতার সবচেয়ে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত 'অন্ধকূপ হত্যা' সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। অন্ধকূপ হত্যার স্মারক স্তম্ভ 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণে রাজনৈতিক নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, ছেনী হাতুড়ী নিয়ে কলঙ্ক স্তম্ভটি চূর্ণ করবার জন্য তাঁর প্রত্যক্ষ আত্ম-নিয়োগের আমি চাক্ষুষ সাক্ষী।[১১]

নতুনরূপে পরিকল্পিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটক সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য :

> জাতীয় চেতনা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কাজেই নতুন মূল্যবোধের তাগিদে ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে ঐতিহ্য এবং প্রেরণার উৎস হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে আমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। একান্তভাবে ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজ-উ-দ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম ও নৈতিক আদর্শে সিরাজ-উ-দ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তার চরিত্রের যে দৃঢ়তা ও মানবিক গুণগুলোকে চাপা দেবার জন্য ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারী ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, এই নাটকে প্রধানতঃ সেই আদর্শ এবং মানবিক সদ্‌গুণগুলোকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।[১২]

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে সিরাজ-চরিত্র পরিকল্পনাই সিকান্দার আবু জাফরের বৈশিষ্ট্য। সমগ্র নাটকটি মোট চারটি অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে চারটি এবং সর্বশেষ অঙ্কে দুটি দৃশ্য রয়েছে। সিকান্দার আবু জাফর অঙ্ক ও দৃশ্যেরও দুটি নতুন নামকরণ করেছেন, 'অধ্যায়' ও 'পরিবেশ'। সর্বমোট চরিত্র ২৯টি। এছাড়া রয়েছে নর্তকী, সৈন্য, পরিচারিকা, নাগরিকবৃন্দ প্রভৃতি।

চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৬৭) বলেন :

> নাটকটির যে ত্রুটি নজরে পড়ে তা এর চরিত্রাবলীর একমাত্রিকতা। চরিত্রাবলী দুই শ্রেণীর ভাল ও মন্দ। ভাল চরিত্র যেমন : সিরাজ, মোহনলাল

---

১০ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ১৭শ সংস্করণ : ১৯৬৫, "সিরাজদ্দৌলা", কলিকাতা, পৃ. ৫

১১ প্রসঙ্গ কথা, "সিরাজ-উ-দ্দৌলা", পৃ. ৫

১২ ঐ, পৃ. ৬

> ধর্মপ্রাণ, দেশপ্রেমী। মন্দ চরিত্রের আবার দুটো ভাগ: ইংরেজ কাপুরুষ, সুযোগ-সন্ধানী আর ষড়যন্ত্রী বাঙালীরা স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক। নাটকের পূর্বাপর আপন আপন একমাত্রিক চরিত্রগুণ থেকে প্রায় কেউই বিচ্যুত নয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠার জাগ্রত আগ্রহ থেকে এই একমাত্রিকতার জন্য।[১১]

এই 'সত্য প্রতিষ্ঠার জাগ্রত আগ্রহ'ই লেখককে নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। এই আগ্রহ নাটকের প্রারম্ভেই পরিলক্ষিত হয়। শচীন সেনগুপ্ত বা গিরিশচন্দ্র ঘোষ সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করলেও এবং বিভিন্ন গুণের সমাবেশে তার চরিত্রকে মহান করতে চাইলেও সেখানে কিছু কিছু বিচ্যুতি অনুপস্থিত নয়। তাছাড়া গিরিশ ঘোষের নাটকের জহুরা এবং করিম চাচা, এবং শচীন সেনগুপ্তের আলেয়া এবং গোলাম হোসেন কাল্পনিক চরিত্র হলেও চরিত্র-চিত্রণের নিপুণতায় এবং জনপ্রিয়তায় এগুলো প্রায় ঐতিহাসিক চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে ইতিহাসের সত্য কল্পনার আড়ালে দূরবর্তী হয়েছে। এদিক থেকে সিকান্দার আবু জাফর ব্যতিক্রম। তিনি সিরাজদ্দৌলার নারী-আসক্তি সম্পর্কিত সকল প্রসঙ্গ সযত্নে পরিহার করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সত্যনিষ্ঠ হতে গিয়ে সমস্ত আবেগ এবং দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সিরাজকে দেখিয়েছেন দেশপ্রেমিক এবং বীরত্বের প্রতীকরূপে। তাই নাটকটির শুরুও একটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

সিরাজদ্দৌলা নবাব হবার কিছু পরেই নিজে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করে কলিকাতা অভিযান চালান এবং ইংরেজদের সুদৃঢ় ঘাঁটি 'কলকাতা দুর্গ' বা 'ক্যালকাটা ফোর্ট' দখল করে কলকাতার নামকরণ করেছিলেন 'আলীনগর'। সিরাজের কলকাতা দুর্গ দখলের দৃশ্য দিয়ে নাটকের শুরু। সিরাজদ্দৌলা যে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ নন, তিনি বীর যোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক—এ সত্য প্রতিষ্ঠাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল।

নাটকের নায়ক সিরাজদ্দৌলাকে সিকান্দার আবু জাফর সৎ, ন্যায়পরায়ণ সাহসী এবং বীর যোদ্ধারূপে চিত্রিত করেছেন। সিরাজ দয়ালু এবং প্রজাপালক। গুপ্তচরের অপরাধের ফলে মোহনলালের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে তিনি বলেন:

> কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই মোহনলাল।[১৪]

এ সিরাজ দুর্বল নন, প্রজাদরদী, দেশপ্রেমিক। তাই দেশের কল্যাণের প্রসংগে ব্যাকুল হয়ে বলেন, 'ওই একটি পথ সিপাহসালার—দেশের কল্যাণ, দেশবাসীর কল্যাণ। ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি।'[১৫]

'বাঙলা ছাড়ো' কাব্যগ্রন্থের সিকান্দার আবু জাফরের তেজস্বী কবিমানস 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকেও প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই তেজস্বিতা প্রকাশ পেয়েছে এ নাটকের সিরাজ

---

১৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৬৭), 'সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্য সাধনা', "বই", পৃ. ৩

১৪ "সিরাজ-উ-দ্দৌলা", পৃ. ৬৯

১৫ ঐ, পৃ. ৩৩

চরিত্রের বিভিন্ন কাজ এবং কথার মাধ্যমে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিবেশে উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন তার কাছে কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ জানায় তখন সিরাজদ্দৌলা কঠিন কণ্ঠে উচ্চারণ করে :

> কেঁদোনা। শুকনো খটখটে গলায় বলো আর কি হয়েছে। আমি দেখতে চাই আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠেছে।[১৬]

এ উক্তি মনে করিয়ে দেয় :

> যমের যদি যম না হ'তে পারো
> ধমক যে তার কঠিন হবে আরও,
> ভয়কে ভয়ের হাঁক শুনিয়ে তবে
> ভূতের ভেল্‌কী হেলায় ভাঙতে হবে।[১৭]

আবার এ সিরাজদ্দৌলা কেবলমাত্র শাসক নন, গৃহীও বটে। তাই শাসনের ভারে ক্লান্ত হয়ে স্ত্রী লুৎফার কাছে তার দেহমন বিশ্রাম চায়। সেখানে রাজ্য তুচ্ছ হয়ে সাধারণ গৃহী হবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে :

> লুৎফা। ---আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দু'জন।
> সিরাজ। অনেক সময় সত্যিই তা ভেবেছি লুৎফা। তোমার খুব কাছাকাছি বহুদিন আসতে পারিনি। আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত। নিশ্চিন্ত সাধারণ গৃহস্থের ছোট্ট সাজানো সংসার আমরা পেতাম।[১৮]

আর একটি ভালো এবং সৎ চরিত্র মোহনলাল। সে দেশপ্রেমিক, ধর্মপ্রাণ, নবাবের সুখ-দুঃখের সংগী। নিজের প্রাণের বিনিময়েও দেশ এবং নবাবকে রক্ষা করতে সে প্রস্তুত। সিরাজের কাছে তার শেষ বক্তব্য—'আমার শেষ যুদ্ধ পলাশীতেই।'[১৯]

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে মীরণ এবং মোহাম্মদী বেগ একেবারেই মনুষ্য-বিবর্জিত এবং লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ এবং কুচক্রী।

ইংরেজরা শঠ, কাপুরুষ এবং প্রবঞ্চক। জগৎশেঠ, মীরজাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ এরা কেউ ক্ষমতালোভী, কেউ অর্থলোভী কিন্তু এরা সিরাজদ্দৌলার ব্যক্তিত্বের কাছে নতশির, সিরাজের ক্ষমতাকে তুচ্ছ করবার ক্ষমতা এদের নেই। এরা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিরাজদ্দৌলার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তার ব্যক্তিত্ব এবং বীরত্বকে স্বীকার

---

১৬ "সিরাজ-উ-দ্দৌলা" পৃ. ৩০--৩১

১৭ সিকান্দার আবু জাফর, 'ভূতভাগানো ছড়া', "বৃশ্চিক লগ্ন", পৃ. ১৪

১৮ "সিরাজ-উ-দ্দৌলা", পৃ. ৬২

১৯ ঐ, পৃ. ৭৪

করে। তাই সিরাজ সম্পর্কে ক্লাইভ যে মন্তব্য করে তার উত্তরে জগৎশেঠ বলে : 'ভগবানের দিব্যি কর্ণেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েছ্ এখনো তার ব্যথা ভোলার কথা নয়'।[২০]

স্বার্থের খাতিরে এরা ইংরেজদের সহগামী হলেও হৃদয় থেকে এরা ইংরেজদের উচ্চস্থান দেয়নি। তাই সুযোগ পেলেই তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করেছে। অথচ উচ্চাশা এবং লোভ তাদের বিশ্বাসঘাতক করে তুলেছে। এ ধরনের চরিত্রের মধ্যে মীরজাফরই প্রধান। সে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ করেও লোভ সম্বরণ করতে পারেনি। সে বলে :

> সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ—নবাব আলিবর্দীর আমলে, উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন, মাত্র একটা দিন যদি ঐ মসনদে মাথা উঁচু করে বসতে পারতাম।[২১]

এই ক্ষমতা লোভই মীরজাফরকে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেছে। তবুও তার বিবেক একেবারে লোপ পায়নি। এজন্যেই সিরাজের ক্ষতি করতে গিয়ে, দেশের অনিষ্ট করতে গিয়ে সে হৃদয়ের মাঝে মরাকান্না শুনতে পায়। বলে :

> সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাঙলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি নাতো?[২২]

একই কারণে প্রকাশ্যে সিরাজের অপমান অথবা তার হত্যার আদেশ দিতে সে কুণ্ঠিত হয়। আবার অন্যদিকে কোম্পানীর ক্ষমতা সম্পর্কেও সে অবগত। তাই সে ভীরু, দুর্বল ব্যক্তিত্বহীন। এই ভীরুতা এবং দুর্বলতা তাকে মাঝে মাঝে ভাঁড়ের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সরাসরি বাংলার সিংহাসনে মাথা উঁচু করে বসবার ক্ষমতা তার নেই। সে বলে :

> 'কর্ণেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে আমি মসনদে বসবো না।'[২৩]

তার এই ভাঁড়ামী দেখে ক্লাইভ পর্যন্ত মন্তব্য করে :

> 'No clown will ever beat him.'[২৪]

রাজবল্লভও একই গোত্রের তবুও ক্লাইভের বড় বড় কথা সেও সহ্য করতে পারে না। তাই ক্লাইভ যখন বলে :

---

২০ "সিরাজ-উ-দ্দৌলা" পৃ. ৪৮

২১ ঐ, পৃ. ৪২

২২ ঐ, পৃ. ৫১

২৩ ঐ, পৃ. ৮৭

২৪ ঐ, প. ৮৭

> নবাবকে আমাদের কোন ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।[২৫]

তখন রাজবল্লভ বলে :

> কেন পারবে না ? গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললেই সব হয়ে গেল নাকি। তুমি এখানে একা এসেছ। তোমাকে ধরে বস্তাবন্দী হুলো বেড়ালের মতো পানা পুকুরে চুবুনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি ?[২৬]

মোটকথা সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকে মীরজাফর এবং রাজবল্লভ, এ দুটি চরিত্র-পরিকল্পনাও অন্যান্য নাটকের তুলনায় ভিন্নতর। অন্যান্য নাটকে এরা কেবলই ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কিন্তু সিকান্দার আবু জাফর তাঁর নাটকে এদের এমনভাবে চিত্রিত করেছেন, যেখানে অন্ততঃ কিছু দ্বন্দ্ব আছে এবং ইংরেজদের সঙ্গে স্বার্থের খাতিরে হাত মেলালেও ইংরেজদের প্রতি এদের আন্তরিক অশ্রদ্ধা অপ্রকাশিত থাকেনি।

এই নাটকের নামকরণ সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। সমগ্র নাটকটির নায়ক সিরাজদ্দৌলা তো বটেই সেই সঙ্গে পুরো বিয়োগান্ত পরিবেশ ঘনীভূত হয়েছে তার অকাল মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। সুতরাং 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের নামকরণ নিঃসন্দেহে যথোপযুক্ত হয়েছে। নাটকটি মূলতঃ মঞ্চের জন্যই রচিত হয়েছিল ফলে গতির দিক থেকে মাঝে মাঝে সামান্য মন্থরতা লাভ করেছে। তথাপি লেখকের উদ্দেশ্য ঠিকই রয়ে গেছে। বিভিন্ন দৃশ্যে নাট্যকার পাঠকের ঔৎসুক্য এবং উৎকণ্ঠা সৃজনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সংলাপও প্রয়োজনানুসারে কঠোর এবং কোমল, অর্থাৎ সহজ, স্বাভাবিক এবং কখনো জোরালো।

মোটকথা লেখকের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকটি রচিত সেদিক থেকে এটি অবশ্যই সার্থকতার দাবী রাখে।

মহাকবি আলাউল

সিকান্দার আবু জাফর রচিত প্রধান নাটক দুটির মধ্যে আর একটি নাটক 'মহাকবি আলাউল'। এটির প্রকাশকাল ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস। 'মহাকবি আলাউল' নাট্যকারের প্রথম নাটক 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। প্রথম নাটকটিতে নাট্যকারের মূল প্রবণতা ছিল বাস্তবধর্মী এবং সত্যনিষ্ঠ হবার দিকে, এবং ঐ নাটকটিতে তিনি যতখানি বাস্তবধর্মী এবং সত্যনিষ্ঠ দ্বিতীয় নাটকটিতে অর্থাৎ 'মহাকবি আলাউলে' তিনি ততখানিই কল্পনাপ্রবণ হয়েছেন। অথচ 'আলাউল'ও 'সিরাজদ্দৌলা'র মতোই ঐতিহাসিক চরিত্র। পার্থক্য এই যে সিরাজদ্দৌলা নবাব আর আলাউল কবি। তাঁর 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকে সিরাজ চরিত্রের যে বিয়োগান্তক পরিণতি তা একান্তভাবেই ইতিহাসাশ্রিত, কিন্তু 'মহাকবি আলাউলে' সে বিয়োগান্তক পরিণতি তার সবটুকুই নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। এই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, নাট্যকার নাটকের শেষে সৈয়দ আলী আহসান-কৃত আলাওলের

---

২৫ 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' পৃ. ৪৭

২৬ পর্বোক্ত।

জীবনী সংযুক্ত করেছেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি সৈয়দ আলী আহসান-কৃত আলাওলের জীবনীকে বিশেষভাবে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন, অথচ নাটকের পাত্র-পাত্রীর মুখের বিভিন্ন সংলাপ থেকে প্রমাণিত হয় যে সৈয়দ আলী আহসান-কৃত আলাওলের জীবনীর সঙ্গে নাট্যকারের 'আলাউলের' জীবনীর অমিল রয়ে গেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে জীবনী অংশ সংযোগ না করাই যুক্তিসংগত ছিল। ২৪ এবং ২৫ পৃষ্ঠায় মাগন ঠাকুর এবং আলাওলের কিছু কিছু সংলাপ থেকে জানা যায় যে আলাওল দৌলত কাজীর অসমাপ্ত রচনা 'লোর চন্দ্রানী'র শেষাংশ রচনা করেছেন এতে সোলেমান অত্যন্ত খুশী এবং মাগন ঠাকুর আলাওলকে মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' অনুবাদের ভার দিয়েছেন। কবিকৃত নাটকের কিছু সংলাপ নিম্নরূপ :

মাগন। আলাউল 'লোর চন্দ্রানীর' শেষ অংশ রচনা করেছে। ভারী সুন্দর হয়েছে।

কাঞ্চন। ---কই আপনি ত' একবারও বলেননি যে, কাহিনীর শেষ অংশ রচনা শুরু করেছেন।

আলাউল। কাউকেই বলিনি। রচনা শেষ না করে বুঝতে পারছিলাম না, জিনিসটা কেমন দাঁড়াবে। দৌলত কাজীর মত মহাপণ্ডিত শিল্পীর অসমাপ্ত রচনা শেষ করবার ভার নেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাহস হয়ত স্পর্ধাও।---

মাগন। ---সুলেমান খুশীতে আত্মহারা। এবার আমাকে খুশী করবার পালা। জানো মীর্জা, আমি আলাউলকে বলেছি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যখানা বাংলায় তর্জমা করতে।"[২৭]

এই সংলাপ অনুযায়ী বলতে হয় 'লোরচন্দ্রানী' আলাওলের প্রথম রচনা এবং 'পদ্মাবতী' দ্বিতীয় রচনা। অথচ নাটকের শেষে সংযুক্ত সৈয়দ আলী আহসানের তথ্যানুযায়ী জানা যায় ১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে আলাওল মাগন ঠাকুরের নির্দেশে প্রথমে 'পদ্মাবতী' রচনা করেন এবং ১৬৫৬তে তারই নির্দেশে তিনি 'লোরচন্দ্রানী'র শেষাংশ লিখেন। সুতরাং মাগন ঠাকুরের সঙ্গে আলাওলের 'সতীময়না লোরচন্দ্রানী' সংক্রান্ত আলোচনাকে নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত বলে ধরে নেওয়া যায়। বস্তুতঃ 'পদ্মাবতী'ই আলাওলের প্রথম রচনা, 'লোরচন্দ্রানী' নয়।

'মহাকবি আলাউল' নাটকের প্রসঙ্গ কথায় নাট্যকার বলেছেন, 'মহাকবি আলাউলের জীবন কাহিনী প্রামাণ্য ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নয়। তাঁর জীবনের যে কয়টি ঘটনা জন-শ্রুতি হিসেবে প্রচলিত সেগুলিও ঐতিহাসিক প্রমাণ নির্ভর তর্কাতীত তথ্য হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে বলে আমার জানা নেই'।[২৮]

তাঁর নিজস্ব এ সংশয়ের পরে সৈয়দ আলী আহসান-কৃত আলাওলের জীবনী অংশ সংযোগ না করাই উচিত ছিল এবং এর ফলে নাটকের ত্রুটিগুলো হয়ত কম প্রকট হত।

---

২৭ সিকান্দার আবু জাফর, "মহাকবি আলাউল", ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ মার্চ ১৯৭০, পৃ. ২৪-২৫

২৮ ঐ, প্রসঙ্গ কথা।

স্মর্তব্য গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ কথা' তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সৈয়দ আলী আহসান-কৃত জীবনীকেই তিনি কিছুটা নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। অথচ কার্যতঃ তিনি আলী আহসান-কৃত তথ্যকেও ব্যবহার করেননি।

নাটকের চরিত্রগুলো সম্পর্কে নাট্যকারের মন্তব্য :

> নাটকে উল্লেখিত সবকটি চরিত্রই ঐতিহাসিক নয়, নাটকের খাতিরে কাল্পনিক ঘটনা সন্নিবেশের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র খুব সহজেই নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি এবং আকর্ষণ অব্যাহত রাখার জন্য সেই অনিবার্য চাহিদাটুকু এড়ানোর কোনো প্রশ্ন ওঠেনি।[২৯]

এই কাল্পনিক চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে মাগন ঠাকুরের কন্যা কাঞ্চন এবং রাজকুমারী মাওশিন। এরা দুজনেই আলাওলের প্রেম কামনা করে। তবে কাঞ্চনের প্রেম অপেক্ষাকৃত তীব্র। অর্থাৎ নাট্যকার কাঞ্চনের হয়েই বলেছেন বেশী। যাই হোক, প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আলাওল যখন 'পদ্মাবতী' রচনা করেন, কাঞ্চন তখন থেকেই তার প্রেম-মুগ্ধ। তখন আলাওলের বয়স ৫১ বৎসর। মাওশিন আলাওলের প্রেমে পড়েছে আরো পরে।

১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে কবি সত্যই মীর্জা নামক এক ব্যক্তির দেয়া অন্যায় অপবাদে কারারুদ্ধ হন। তখন তার বয়স ৬৬ বৎসর। নাটকের শেষ দৃশ্যটিও নাট্যকারের কল্পনা-প্রসূত। নাটকের শেষ দৃশ্যে তিনি দেখিয়েছেন আলাওল দেশত্যাগ করছেন আর কাঞ্চন এবং মাওশিন এই দুই প্রেমিকা ক্রন্দনরতা। প্রকৃতপক্ষে কারামুক্তির পরেও ১৬৭৩ পর্যন্ত অর্থাৎ কবির মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আরাকানেই ছিলেন এবং আরো চারটি গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। তাছাড়াও নাট্যকার মাওশিন এবং কাঞ্চনের বয়সের উল্লেখ করেন নি। এ সম্পর্কে ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বক্তব্য :

> নাট্যকার তাঁর নায়িকাদের বয়সের কোন আভাস দেননি, ফলে বৃদ্ধ কবির জন্য দুই যুবতীর প্রেমের স্বাভাবিকত্ব বিনষ্ট হয়েছে।[৩০]

নাট্যকার 'প্রসঙ্গ কথা'য় একটি কথা বলেছেন যা এই নাটকটি বিচারের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে। তিনি বলেছেন—'কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে তিনি অসাধারণ শক্তিধর শিল্পী ছিলেন'। সেই সত্যকে জয়যুক্ত করা এবং মহিমান্বিত করা এই নাটক রচনার উদ্দেশ্য।[৩১]

যুক্তি-তর্ক এবং জীবনী সম্পর্কিত তথ্যের সত্যাসত্য বিচারের প্রসঙ্গ বাদ দিলে নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্য রক্ষায় সফল হয়েছেন। নাটকের শুরুতেই গুণমুগ্ধ পিতা এবং গুণী পুত্রের কথোপকথন। পিতার মুখে পুত্রের প্রশংসাবাণী এবং স্বীকৃতি :

---

২৯ পূর্বোক্ত।

৩০ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৩১ প্রসঙ্গ কথা, "মহাকবি আলাউল"।

তোমার গান যে-কোন সমঝদার শ্রোতাকে আনন্দ দেবে। তুমি গুণী।[৩২]

পরবর্তী পর্যায়ে ঘটনাক্রমে রাজদরবারে আলাওলের স্থান লাভ, মাগনের স্নেহ এবং সাধুবাদ এবং পরিশেষে কাঞ্চন এবং মাওশিনের মুগ্ধতার মধ্য দিয়ে নাট্যকার এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মহাকবি আলাওলকে নিয়েই সমগ্র নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। সুতরাং নামকরণের ক্ষেত্রে কবির নামানুসারে নাটকের নামকরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হয়নি। নামের বানানের ব্যাপারে যে ব্যতিক্রম চোখে পড়ে সে সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য :

> মহাকবি আলাউলের নামের বানানটা কোন সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে মনে করি না। বিভিন্ন গবেষক আলাউলের রচনার যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার ভেতরে আলাওল এবং আলাউল উভয় বানানই দেখা যায়। আমি নিজের খুশীমত আলাউল বানানটাই গ্রহণ করেছি।[৩৩]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আলাউল নামের বানানে নিম্নলিখিত বিভিন্নতা দেখা যায় :
দীনেশচন্দ্র সেন (১৩০৩), আলাওল [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য]
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৩৩১), সৈয়দ আলাওল [সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা]
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৩৩২) ও মুহম্মদ এনামুল হক (১৩৩২), আলাওল [আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য]
সুকুমার সেন (১৩৫৮), আলাওল [ইসলামী বাংলা সাহিত্য]
আহমদ শরীফ (১৩৬৪), আলাউল (হক) [আলাউল বিরচিত তোহফা : সাহিত্য পত্রিকা]
কাজী দীন মুহম্মদ (১৩৬৪), আলাওল [পদ্মাবতী কাব্যে আলাওল : সাহিত্য পত্রিকা]
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৩৬৭), আলাউল [কবি আলাউল]
সৈয়দ মুর্তজা আলী (১৩৬৮), আলাউলের তোহফা [বাংলা একাডেমী পত্রিকা]
সৈয়দ আলী আহসান (১৩৬৯), আলাওল [জায়সী ও আলাওল : সাহিত্য পত্রিকা]
সিকান্দার আবু জাফর (১৩৭৩), আলাউল [মহাকবি আলাউল]

আঙ্গিকের বিচারে 'মহাকবি আলাউল' 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তুলনায় নিঃসন্দেহে দুর্বল। কাহিনী গ্রন্থনায়, উৎকণ্ঠা সৃজনে, মন্থর গতিতে এবং ঐতিহাসিকতা রক্ষার কিছু কিছু ত্রুটিতে এটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং ভাবাবেগপূর্ণ নাটক।

শকুন্ত উপাখ্যান

'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' এবং 'মহাকবি আলাউল' এ দুটি সিকান্দার আবু জাফরের প্রধান নাটক হলেও তাঁর আরো কিছু সংখ্যক রূপক নাট্য এবং একাংকিকা আছে, সেগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'শকুন্ত-উপাখ্যান' এবং 'মাকড়সা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

৩২ "মহাকবি আলাউল", পৃ ২

৩৩ প্রসঙ্গ কথা, "মহাকবি আলাউল"।

'শকুন্ত-উপাখ্যান' একটি রূপক নাটিকা। এটি প্রকাশিত হয়, সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকায় (১৩৬৮; ৫ : ৩–৫)। 'নাটিকাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার কোন পাত্র-পাত্রীই মানুষ নয়, সমস্ত চরিত্রই কতগুলো বিভিন্ন জাতের পাখী। আলোচ্য নাটকটিতে এই বিভিন্ন জাতের পাখীর রূপকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বিশেষ কিছুসংখ্যক উচচ ক্ষমতাবান মানুষের নির্বুদ্ধিতা এবং ক্ষমতার লোভকে ব্যাঙ্গ করে পরিশেষে দেখাতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধ নয়, ক্ষমতা নয়, ভালোবাসা এবং মৈত্রীর বন্ধন দিয়েই মানুষকে জয় করা সম্ভব। মানুষের মঙ্গলের জন্য এর চাইতে শ্রেষ্ঠ পন্থা আর দ্বিতীয়টি নেই। এ প্রসঙ্গে নাটকটির শেষাংশের কিছু উদ্ধৃতি দিলেই কথাটির যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে। বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে স্বপ্নগ্রামের সম্রাট কল্পগ্রামের সম্রাট হংসগর্বকে পরাজিত করেছে, কিন্তু হংসগর্বের মিত্রপক্ষ স্বপ্নগ্রাম আক্রমণ করবে এই সংবাদে ভীত মণিপুচ্ছ তার মন্ত্রী দিকচক্ষুকে পাঠিয়েছে সম্রাট হংসগর্বের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। হংসগর্বের প্রধানমন্ত্রী জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান। সে সানন্দে এ প্রস্তাব সমর্থন করেছে। স্বপ্নগ্রামের চতুর প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সন্ধির উল্লেখ করে অবশেষে 'সুবর্ণ সন্ধি'র প্রস্তাব করে বলেছে :

> দিকচক্ষু। সত্যের প্রতিষ্ঠায় এর শুরু সখ্যতার বন্ধনে এর শেষ। একে বলুন মৈত্রীর সন্ধি।
>
> হংসগর্ব। 'ধন্য, ধন্য মহামন্ত্রী। স্বপ্নগ্রামের আলিঙ্গন গ্রহণ করুন। (দিকচক্ষুকে আলিঙ্গন দান) মহত্বের অধিকার, হৃদয়ের অধিকার, জীবনের অধিকার যে সন্ধির শর্ত তাই স্বাক্ষরিত হোক, শুধু আমাদের ভেতরেই নয়—দেশে দেশে যুগে যুগে।[৩৪]

মাকড়সা

'মাকড়সা' একাংকিকাটি প্রকাশিত হয় ১৩৬৬ (সমকাল ৩ : ৮) সালে। মাকড়সা সম্বন্ধে ঈসমাইল মোহাম্মদ লিখেছেন, 'পাকিস্তানী নিগড়ে আবদ্ধ লাঞ্ছিত লুণ্ঠিত বাঙ্গালীর অন্তরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফল্গুপ্রবাহের একটি মূল্যবান দলিল মাকড়সা'।[৩৫]

আলোচ্য একাংকিকাটিতে প্রধান চরিত্র মোট পাঁচটি। একজন আসামী আর বাকি চারজন ফরিয়াদীর মধ্যে একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, একজন স্কুল শিক্ষক, একজন তরুণী এবং একজন চাষী। আসামীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ এই যে আসামী তাদের স্বপ্ন চুরি করেছে। প্রকৃতপক্ষে সে স্বপ্ন এবং আদর্শের ভিত্তিতে তৎকালীন পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল কিছুদিন পরেই সে স্বপ্ন এবং আদর্শের ভিত ধ্বসে যায়। বিশেষতঃ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক আইনের প্রবর্তন অবশিষ্ট স্বপ্নকেও নস্যাৎ করে দেয়। অথচ বাঙালী স্বপ্ন দেখেছিল আলো, স্বাধীনতা আর মুক্তির। বিভিন্ন ফরিয়াদীর কণ্ঠে তারই ঘোষণা, সেই স্বপ্নের কথা। এ মুক্তি সুন্দর আলোর মতো, সোনালী দিনের মতো।

---

৩৪ "শকুন্ত উপাখ্যান", ১৩৬৮, 'সমকাল', (৫ :৩-৫) পৃ. ২৪৫

৩৫ ঈসমাইল মোহাম্মদ, "নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর," 'সমকাল', সিকান্দার আবু জাফর স্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ৮৮

১ম সাক্ষী—হঠাৎ একটি চোরা কুঠুরী থেকে বেরিয়ে আসে ভিন্ন জাতের আর একটি শাবক। রূপা রঙের পালক ঢাকা এক টুকরো সকাল পালিয়ে আসে, অমাবস্যার দরজা ভেঙে। হাজার বছর ধরে একটি সোনালী দিন ছেনে তৈরী করা এক তাল মাখন সেই শাবকটি।৩৬

কিন্তু বুকের অন্ধকার নিভৃত চোরা কুঠুরীতে লুকিয়ে রেখে লালিত করা এই শাবকরূপ স্বপ্ন বার বার ভেঙে গেছে শাসকের আঘাতে। সেই ব্যর্থ স্বপ্নের বিদ্রোহের প্রতীক 'মাকড়সা'। ফরিয়াদী চারজন বাংলারই লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত গণমানসের প্রতীকমাত্র। আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ব্যক্তি স্বয়ং আইয়ুব খান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং আইয়ুবী আমলের গণ-আন্দোলন অবলম্বনে রচিত কবির বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। কবির কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে এ সমস্ত কবিতার আলোচনা করা হয়েছে।৩৭ এ কবিতাগুলোর মধ্যে কবির ক্রোধ, বিরাগ এবং অসন্তোষ স্পষ্টতঃই প্রকাশিত।

সিকান্দার আবু জাফরের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে একটা বক্তব্য প্রায় সময়ই ঘুরে ফিরে এসেছে, সেটি হল কবির প্রচণ্ড আশাবাদী মনোভাব পূর্বাপর তাঁর সব গ্রন্থতেই প্রকাশিত। কোথাও ভেঙে পড়া হাহুতাশ স্থায়িত্ব লাভ করেনি। অদৃষ্টের হাতে তিনি নিজেকে অথবা মানুষকে সমর্পণ করতে নারাজ। কবির বক্তব্য :

স্খলিত জীবন শক্তিতে
তবু জীবনের তপস্যা
বাঁচিতেই হবে একান্ত
মার খাব তবু মরব না।৩৮

আলোচ্য একাংকিকাটিতেও কবির একই মনোভাব সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এখানে কোথাও তিনি অদৃষ্টবাদী হয়ে ওঠেননি। নিপীড়িত জনতার চরম দুর্দশার চিত্র এঁকে তাদের তিনি অদৃষ্টের হাতে সমর্পণ করেননি বরং এর প্রতিকারের পথ খুঁজেছেন। আলোচ্য একাংকিকার সমস্ত চরিত্রই নিপীড়িত সর্বহারার দল। এই সমস্ত সর্বহারা স্বপ্নহারার দল অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে বসে না থেকে অত্যাচারের প্রতিকার কল্পে বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আসামীর উপর। ফলে এরা অসহায় বাঙালীর প্রতীক না হয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে দৃঢ়সংকল্প সংগ্রামী বাঙালীর প্রতীক হয়ে উঠেছে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাঙালীর যে সংগ্রাম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি 'মাকড়সা'য় সেই সংগ্রামের সূচনা লক্ষণীয়।

'শকুন্ত উপাখ্যান' এবং 'মাকড়সা' ছাড়াও আরো কয়েকটি রূপক নাট্য এবং একাংকিকা সিকান্দার আবু জাফর রচনা করেছেন। যেমন ১৯৫৫ সালের ১৬ই মার্চ থেকে ধারাবাহিকভাবে "মিল্লাত" পত্রিকায় প্রকাশিত 'অভিনেতা' (নাট্যকার নিজে যাকে বস্তুতান্ত্রিক নাটক বলে অভিহিত করেছেন)। মুসলিম লীগ আমলে নির্বাচনী

---

৩৬ সিকান্দার আবু জাফর "মাকড়সা" ১৩৬৬, 'সমকাল' (৩:৮) পৃ. ৫৮৬-৫৮৭

৩৭ মাহবুবা সিদ্দিকী, ১৯৭৯, "সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার", অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৮ সিকানদার আবু জাফর, 'কত ঈশ্বর', "কবিতা ১৩৭২", পৃ. ২৫

কারসাজি নিয়ে তিনি একটি বিচিত্র নাটক লেখেন, যাকে তিনি 'স্বপ্নদৃষ্ট নাটক' বলেছেন এবং নামকরণ করেছিলেন 'নির্বাচনী ভূমিকা'। ১৩৬০ সালে প্রকাশিত এই নাটকটিতে তিনি সরাসরি নুরুল আমিন, মোনায়েম খাঁ প্রমুখ নেতাকে আক্রমণ করেছেন। নাটকটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ৩১-১২-৫৩ থেকে ৩-১-৫৪ পর্যন্ত 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায়।

এইসব রূপক-নাট্য এবং একাংকিকাগুলোতে সিকান্দার আবু জাফরের সমকালীন এবং সাধারণ রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় বিধৃত। তথাপি নাট্যকার হিসেবে 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' এবং 'মহাকবি আলাউলে'ই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক, যদিও নাটক দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী।